শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ক্ষেত্র সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে

মানবসভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশেই গবেষণার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ এবং গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থী। একজন শিক্ষার্থীর গবেষণাধর্মী মনোভাবের বিকাশে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের দায়িত্বও কম কিছু নয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও গবেষণার লক্ষ্যে সঠিকভাবে এগোনো প্রয়োজন। পড়াশোনা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক আলোচনা করলেন সিকিম ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়।

প্রশ্ন ১) আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা গবেষণা করতে চায় তাদের কী কী পরামর্শ দিতে চান?

● এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে গবেষণা মানে কী। গবেষণার অর্থ হল সৃজনশীল ও পদ্ধতিগত কাজের মাধ্যমে মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং ব্যবহার। সাধারণত, গবেষণায় পূর্ববর্তী কাজের ফলাফলগুলির পুনরাবৃত্তি করে, নতুন বা বিদ্যমান সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। এক বা একাধিক তত্ত্বকে সমর্থন করা বা নতুন তত্ত্ব বিকাশ করতে গবেষণা মূলত ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের গবেষণার মধ্যে মৌলিক গবেষণা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক গবেষণায় প্রাথমিক প্রয়োজন হল (১) মানব জ্ঞান অগ্রগতির জন্য পদ্ধতি আবিষ্কার, (২) পদ্ধতির ডকুমেন্টেশন, (৩) ব্যাখ্যা ও (৪) সামগ্রিক উন্নয়ন। সাধারণত গবেষণার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেমন– বৈজ্ঞানিক, মানবিক, শৈল্পিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসা, বিপণন, অনুশীলনকারী, জীবন এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা।

এক্ষেত্রে জেনে রাখা দরকার যে, গবেষণার মূল পদক্ষেপগুলি হল : (১) সমস্যা শনাক্তকরণ, (২) সাহিত্য পর্যালোচনা, (৩) উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা, (৪) নির্দিষ্ট প্রশ্ন নির্ধারণ করা, (৫) ধারণামূলক ফ্রেমওয়ার্কের নির্দিষ্টকরণ, (৬) অনুমানের মাধ্যমে একটি পদ্ধতির চয়ন করা, (৭) তথ্য সংগ্রহ, (৮) তথ্য যাচাই করা, (৯) বিশ্লেষণ করা, (১০) তথ্য ব্যাখ্যা করা, (১১) লিপিবদ্ধকরণ, (১২) মূল্যায়ন, (১৩) ফলাফল যাচাই এবং (১৪) ভবিষ্যৎ নির্ধারক বক্তব্য পেশ করা।

প্রশ্ন ২) স্কুল লেভেল থেকেই যাতে শিক্ষার্থীদের গবেষণাধর্মী মনোভাব গড়ে ওঠে সেজন্য অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতি আপনার বার্তা কী?

● এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল অভিভাবক এবং শিক্ষক উভয়কে শিক্ষার্থীদের মনের কাছে পৌঁছানো যাতে তাদের আগ্রহের ক্ষেত্র সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। যদি মনে হয় যে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রতি খুব আকর্ষিত তাহলে অভিভাবক এবং শিক্ষক উভয়কে সেই বিষয়কে আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলার পিছনে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্নরকম অনলাইন কোর্স, শিক্ষামূলক ভিডিয়ো বা ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে বিষয় বা বিষয়গুলির অনন্যতাকে প্রতিফলিত করে সমধর্মী একাধিক বিষয় সম্পর্কে উৎসাহিত করতে হবে এবং বর্তমানে গবেষণা করছেন এরকম ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলিয়ে নিতে হবে। এই সমস্ত অভিজ্ঞ ছাত্ররা, উৎসাহিত শিক্ষার্থীদের কীভাবে গবেষণা শুরু করতে হয় তা জানাতে পারে। অনুষদ স্পনসর শনাক্তকরণ সম্বন্ধীয় প্রারম্ভিক তথ্য জানানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কীভাবে রিসার্চ নেটওয়ার্কিং উপলব্ধ করা যায় সেই সুযোগ সম্পর্কেও জানানো আরেকটি দুর্দান্ত উপায়। প্রশিক্ষক, শিক্ষাদানকারী, উপদেষ্টা এবং প্রতিষ্ঠিত প্রফেসারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলা শুরু করানো উচিত।

এছাড়াও, অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনকে গবেষণাকেন্দ্রিক করা যেতে পারে, যেমন (১) মনের বৈজ্ঞানিক অভ্যাস, (২) কৌতূহল উৎপাদন, (৩) অনুসন্ধিৎসা জাগরণ, (৪) প্রয়োগমূলক শ্রেণিকক্ষ জ্ঞান স্থানান্তরকরণ, (৫) গবেষণা বিষয়ক মানসিক দক্ষতার বিকাশ, (৬) প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্মোচন, (৭) আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষাদান (অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় গবেষণা সরঞ্জাম, মাইক্রোস্কোপ, ব্রুনটন কম্পাস, জিপিএস ইত্যাদি) (৮) ক্ষেত্রগত তথ্য সংগ্রহ (ভূতাত্ত্বিক ম্যাপিং, কাঠামোগত এবং/অথবা স্ট্র্যাট্রিগ্রাফিক বিশ্লেষণ, নমুনা নির্বাচন এবং সংগ্রহ, ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির রিয়েল–টাইম পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি), (৯) ল্যাবরেটরি দক্ষতা বর্ধন (পরিচ্ছন্নতা প্রোটোকল, মানের বিশ্লেষণ/মান নিয়ন্ত্রণ), (১০) কম্পিউটেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি, (১১) লিখিত বা মৌখিক যোগাযোগ, (১২) পরিমাণগত বোধ শক্তি বিকাশ, (১৩) আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (পেশাগত অভ্যাস, পেশাগত নৈতিকতা), (১৪) ব্যক্তিগত মান বিকাশ (দায়িত্ব বোধ, সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো কাজ করার অভ্যাস, প্রকল্প উৎসর্গীকরণ, প্রতিশ্রুতি প্রচেষ্টা), (১৫) গবেষণা দক্ষতা বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষ কৌশল রপ্ত করা, (১৬) শেখার এবং ব্যবহারিক ও বুদ্ধিজীবী গবেষণা অনুশীলন, (১৭) পরীক্ষালব্ধ নির্ধারিত ফলাফলগুলি বোঝা এবং (১৮) মেটাকগনিটিভ দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রশ্ন ৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেরই সৃজনশীল মনোভাব রয়েছে, কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়ার কারণে প্রতিভা হারিয়ে যায়, এক্ষেত্রে আপনি কী বার্তা দিতে চান?

● শিক্ষার্থীদের সঠিক পথের সন্ধান পেতে গেলে কয়েকটি বিষয় তাদের মনে রাখতে হবে :

১) আত্মসচেতনতা অর্থাৎ নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকা।

২) নিজের চেষ্টায় নতুন কিছু শেখার আগ্রহই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা।

৩) স্কুল শিক্ষক বা কলেজ শিক্ষক বা ইউনির্ভাসিটি অধ্যাপকের সঙ্গে ক্রমাগত কেরিয়ার সম্পর্কে পরামর্শ করতে হবে।

৪) শিক্ষানবিশি কেন্দ্রিক ফলাফল ভিত্তিক নির্দেশাবলি ব্যবহার করা খুবই দরকারি।

৫) শিক্ষক–শিক্ষার্থী অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

৬) গৌতম বুদ্ধের বাণী অনুযায়ী, সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের পথ এবং গুরু দুই–ই অনুসন্ধান করতে হবে।

৭) সৃজনশীলতা গবেষণার একটি অংশ ঠিকই কিন্তু গবেষণা সম্পূর্ণরূপে সৃজনশীলতার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। যদিও শিল্প, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অ্যানিমেশন, গ্রাফিকস– এই সকল গবেষণার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পাশাপাশি অসীম ধৈর্য ও সূক্ষ্ম চিন্তনের প্রয়োজন।

আরেকটি কথা এখানে বলা খুব প্রয়োজন সেটি হল, কেউ যদি গবেষক হতে চাও বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে, তাহলে তাকে মনে রাখতে হবে যে, গবেষণার সাফল্য চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল : নৈপুণ্য, ধৈর্য, অর্থ ও ভাগ্য।

প্রশ্ন ৪) আপনার বর্তমান গবেষণার বিষয় কী? শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার জন্য একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?

● আমি বর্তমানে কয়েকটি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১) ডিউ কম্পিউটিং এবং ২) ইনটারনেট অফ থিংগস। একটু ব্যাখ্যা করে বলি –

১) ডিউ কম্পিউটিং : ডিউ কম্পিউটিং একটি নবতম তথ্যপ্রযুক্তি প্যারাডাইম যা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মূল ধারণাগুলির সঙ্গে এন্ড ডিভাইসগুলিকে (ব্যক্তিগত কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) যুক্ত করে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এটির মূল উদ্দেশ্য হল, ক্লাউড কম্পিউটিং এর কনসেপ্ট ব্যবহার করে এন্ড ইউজারদের তথ্যপ্রযুক্তিগত সমস্যাগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করা। ডিউ কম্পিউটিং–এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ইনটারনেট অ্যাক্সেসের উপর সামগ্রিক নির্ভরতা কমানো।

এর মূল উদ্দেশ্য হল কীভাবে ইনটারনেট কানেকশন ব্যবহার না করে ইনটারনেট ডাটা অ্যাক্সেস করা যায়। বর্তমানে আমি ডিউ ক্লাস্টার, সুপার হাইব্রিড পিয়ার টু পিয়ার কমিউনিকেশন এবং ডিউ এড হক নেটওয়ার্ক তৈরি করার চেষ্টা করছি।

এই মুহূর্তে আমি কানাডা, ক্রোয়েশিয়া, আমেরিকা, ম্যাসেডোনিয়া, জার্মানি এবং রোমানিয়ার একটি রিসার্চ গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছি। ইউরোপিয়ান কমিশনের কাছে একটি ইনটারন্যাশনাল প্রোজেক্ট জমা করা হয়েছে যেখানে শুধু আমি সম্পূর্ণ এশিয়া মহাদেশ থেকে রিপ্রেজেন্ট করছি। যদিও এই রিসার্চ এখন খুব ইনিশিয়াল অবস্থায় আছে, আমি এবং আমার বিদেশি সহযোগীরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত ডিউ কম্পিউটিংকে মানুষের কাজে লাগানো যায়।

২) ইনটারনেট অব থিংগস : এটিও একটি নতুন টেকনোলজিক্যাল প্যারাডাইম যার উদ্দেশ্য হল যেকোনো ধরনের বস্তুকে (অ্যানালগ বা ডিজিট্যাল) ইনটারনেটের সঙ্গে যুক্ত করা এবং নতুন স্মার্ট সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করা। বর্তমানে আমি 'ইনটারনেট অব স্কিলস' নামক একটি বিষয়ের উপরে কাজ করছি যা কিনা ইনটারনেট অব থিংগস এরই স্পেশালাইজড ভারশন। আমার লক্ষ্য হল নতুন ধরনের আর্কিটেকচার এবং অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (5G) ব্যবহার করে একজন স্পেশালিস্ট মানুষের স্কিল বা দক্ষতাকে অন্য একজন অদক্ষ বা শিক্ষানবিশের মধ্যে সঞ্চালিত করা। যেমন ধরো, একজন রোগীর জটিল নিউরোসার্জারির অতিসত্বর প্রয়োজন, কিন্তু সেই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষে সেইরূপ দক্ষ চিকিৎসক উপলব্ধ নেই। অথচ, আমেরিকাতে একজন অতীব দক্ষ নিউরোসার্জন আছেন যিনি এই জটিল সার্জারি করতে সক্ষম। কিন্তু ভৌগোলিক, সময়গত এবং অর্থনৈতিক কারণবশত সেই রোগীর পক্ষে এই সুবিধা উপলব্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমেরিকান এবং ভারতীয় সার্জন উভয়েই ইনটারনেট অব স্কিলস উদ্ভূত গ্লাভস হাতে পরে একসঙ্গে এই সার্জারিটি সম্পন্ন করতে পারবেন। আমেরিকান সার্জন ভার্চুয়ালি একটি ম্যাথামেটিক্যাল বায়োমডেলের ওপরে অপারেশন পারফর্ম করবেন এবং একইসঙ্গে উপরোক্ত সার্জারির দক্ষতা ইনটারনেট অব স্কিলসের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারতীয় সার্জনের গ্লাভসের দ্বারা রোগীর উপর প্রযুক্ত হবে এবং রোগীর চিকিৎসা সম্ভবপর হবে। এই ইনটারনেট স্কিলস প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুফল লাভ করতে পারি। যেমন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, কলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা বা নৈপুণ্যকে আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় নিয়ে এই প্রতিবেদনটি আমি শেষ করতে চাই, সেটি হল পারভাসিভ বায়োমেডিকেল ইনফরমেটিক্স। এটি আমি এবং আমার সহযোগী মিলে প্রথম প্রবর্তন করছি। এই মৌলিক গবেষণাটির উদ্দেশ্য হল : ১) কম খরচে অল্প সময়ে উচ্চমানের ইনফরমেটিক্স পদ্ধতির মাধ্যমে রোগ সম্পর্কিত আগাম সূচনা, নির্ণয় এবং রোগ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ২) ল্যাপটপ, মোবাইল বা স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উপরোক্ত লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা এবং ৩) ইউবিকুইটাস থিয়োরির মাধ্যমে আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন, ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিংকে কাজে লাগিয়ে বায়োমেডিকেলগত বিষয়ে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়কেই অবগত করা। এর মূল লক্ষ্য হল মানবসমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ বিধান। এর দ্বারা আমরা একটি নতুন গবেষণার দিকনির্দেশ করছি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চিন্তা, অংশগ্রহণ ও বাণিজ্যিককরণে অনেকাংশে নতুন আলো দেখাবে।

বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ

দশম শ্রেণি ঃ ইতিহাস

মধুরূপা ব্যানার্জি
শিক্ষিকা, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

১। ভারতে সর্বপ্রথম কবে কারা কোথায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ– ১৫৫৬ সালে পোর্তুগিজরা গোয়ায় সর্বপ্রথম আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

২। প্রথম কে কবে কোথায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ– জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ ১৪৫৪ সালে জার্মানির মেইন্জ শহরে প্রথম আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাংলায় শিক্ষার প্রসারে কী ধরনের সুবিধা করে দেয় ?

উঃ– আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাংলায় শিক্ষার প্রসারে নানাভাবে সহায়তা করে –

i) ছাপাখানায় মুদ্রিত বিপুল সংখ্যক বই অল্প সময়ে পাঠক ও শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে যায়। ii) ছাপাখানায় মুদ্রিত বইয়ের মূল্য হাতে লেখা বইয়ের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় দরিদ্র ও সাধারণ পড়ুয়ারা বইপত্র কিনতে সক্ষম হয়। iii) হাতে লেখা বইয়ের তুলনায় ছাপাখানায় মুদ্রিত বইগুলি বানান ভুল বা হাতের লেখা পড়তে না পারা ইত্যাদি ত্রুটিমুক্ত হতে সক্ষম হওয়ায় সেগুলি অনেক বেশি নির্ভুল। iv) ছাপাখানাগুলিতে বহু বাংলা বই মুদ্রিত হওয়ায় মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়।

৪। চার্লস উইলকিনসন নির্মিত বাংলা টাইপ সম্পর্কে কী জানো ?

উঃ– চার্লস উইলকিনসন সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের টাইপ বা নকশা তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা অক্ষরে নাথানিয়েল ব্রাসো হ্যালহেড রচিত 'A Grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮) গ্রন্থটি ছাপা হয়।

৫। উইলিয়াম কেরি কবে এবং কী উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ– উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি আধুনিক ছাপাখানা শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বইপত্র ছাপা হত। বাংলার গদ্যসাহিত্যের প্রসারে এই ছাপাখানার অবদান অপরিসীম।

৬। কারা শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত ছিলেন ?

উঃ– শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত ছিলেন।

৭। প্রথম সচিত্র বাংলা বই কোনটি ? এই বইয়ের চিত্রগুলি কে এঁকেছিলেন ?

উঃ– প্রথম সচিত্র বাংলা বই ছিল ভারতচন্দ্র রচিত এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'। এই বইয়ের চিত্রগুলি এঁকেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়।

৮। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর বিরুদ্ধে বাংলায় গড়ে ওঠা দুটি উদ্যোগ উল্লেখ করো ?

উঃ– ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর বিরুদ্ধে বাংলায় গড়ে ওঠা দুটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল – i) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বদেশি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা। ii) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন 'গোলদিঘির গোলামখানা' বলে ব্যঙ্গ করা হত ?

উঃ– কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গোলদিঘির নিকট অবস্থিত ছিল। এখানে পড়াশোনা করে শুধু ব্রিটিশদের অফিস–আদালতের কেরানি তৈরি হত। এজন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদিঘির গোলামখানা' বলে ব্যঙ্গ করতেন।

১০। বাংলার (Bengal) প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র কোনটি ? বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি ? বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি ?

উঃ– বাংলার (Bengal) প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হল 'দি বেঙ্গল গেজেট' (The Bengal Gazette)। এটি হিকিস বেঙ্গল গেজেট (Hicky's Bengal Gazette) নামেও পরিচিত। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'দি বেঙ্গল গেজেট' (The Bengal Gazette)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হল সংবাদ প্রভাকর।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ পরিনাম!

গবেষণায় জানা গিয়েছে, গত ৫৫ বছরে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বছরে সাড়ে নয় লক্ষ কোটি টনেরও বেশি হিমবাহের বরফ গলেছে। এর ফলে সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ২৭ মিলিমিটার। এভাবে চলতে থাকলে আগামী শতাব্দীতে আর কোনো হিমবাহ অবশিষ্ট থাকবে কি না সেটাই উদ্‌বেগের।

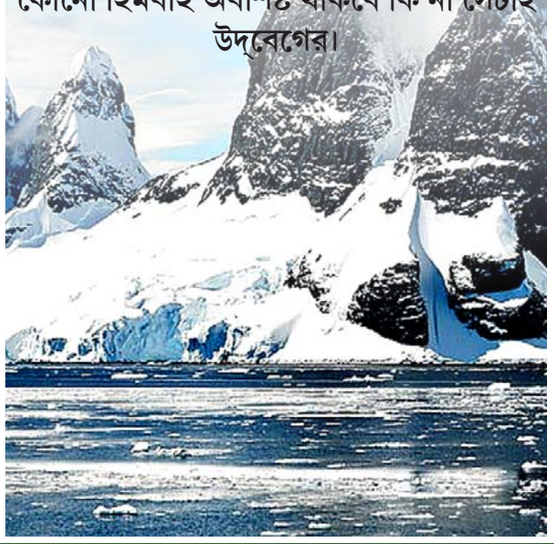

সাফল্যের উড়ানে প্রবাসে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের ফ্রেড হাচিনসন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত বৈজ্ঞানিক নভোনীল দে সরকার। সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করার নিজের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পথ প্রদর্শনে সুদূর ওয়াশিংটন থেকে পড়াশোনা বিভাগে পরামর্শ দিলেন।

● মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর থেকে উত্তীর্ণ হই। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও রেজাল্ট ছিল সাধারণ মানের। মেডিকেল এনট্রান্সেও ভালো ফল না হওয়ায় জুলজি অনার্সে কলকাতার আশুতোষ কলেজে ভরতি হই। পরের বছর আরও একবার জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার ইচ্ছে থাকলেও কলেজে অধ্যাপকগণের অনুপ্রেরণায় জুলজি বিষয়টাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ভবিষ্যতে গবেষণার লক্ষ্যে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিই। স্নাতকস্তরে উত্তীর্ণ হয়ে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে এনট্রান্স দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভরতি হই। উল্লেখ্য, এই সময় EVS MSC কোর্সের অনেকটাই জুড়ে ছিল বায়োলজি, ইকলজি, ইভলিউশনারি বায়োলজি, জেনেটিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয়। ভবিষ্যতের রিসার্চ ইন্টারেস্টকে মাথায় রেখে আমি লাইফ সায়েন্স নেট–এর পথ বেছে নিয়েছিলাম। MSC পাসের বছরেই Ph.D–এর সুযোগ হয়নি আমার। এতে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙেনি। বরং IISC Bangalore ও কলকাতার IICB–তে ট্রেনি হিসেবে রিসার্চের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকি। পাশাপাশি Bio–Statistics–এর অনুশীলন শুরু করি। এর মধ্যেই লিউকেমিয়া ক্যানসারে আক্রান্ত বোনকে হারাই। এরপর ঠিক করে ফেলি ইভলিউশনারি বায়োলজিস্টের চোখ দিয়ে ক্যানসার রিসার্চে নিজেকে সমর্পণ করব। পরের বছর কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের হিউম্যান জেনেটিক্স ইউনিটে সুযোগ পাই এবং দুই বার NET–JRF–UGC–এর NET–JRF–CSIR –এ কোয়ালিফাই করি।

● গতানুগতিক মুখস্থ করার মতো কিন্তু পিএইচডির পথ একেবারেই নয়। বছরের শেষে পারফরম্যান্স টেস্ট বা বাধ্যতামূলক কিছু কোর্স থাকলেও সেটুকু পড়ে লেখাই কিন্তু পিএইচডির জন্য যথেষ্ট নয়। কিছু অতিরিক্ত গুণাগুণের প্রয়োজন হয় এখানে। অনেকেই সেই গুণকে বলেন রিসার্চ অ্যাপটিটিউড। কিছু ছাত্রছাত্রীর শুরু থেকেই খুব ধারালো থাকে এই গুণ। আবার কারও ক্ষেত্রে এটি ধারালো করতে কিছুটা সময় লেগে যায়। ঠিক এখানেই প্রয়োজন ধৈর্য, অনুশীলন, শৃঙ্খলাবোধ ও একাগ্রতার। আমি ছিলাম এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় দলের শিক্ষার্থী। ক্যানসার রিসার্চে আমি ঠিক কী করতে চাই, এই ভেবেই আমার প্রথম একবছর অতিবাহিত হয়। অনেকেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয় বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়ে ফেলার পর। থেমে কিছুই থাকে না। সকলেই কিছু না কিছু উত্তর খুঁজে ঠিক পেয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে এই আবদ্ধ দশা কাটে প্রথম একটি International Symposium–এ গিয়ে।

● এই সময়ে নতুন Genomic Technology– এর Revolution বা প্রসার শুরু হয় সারা বিশ্বে। ISI কলকাতার সাহায্যে সুযোগ আসে বিদেশে গিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়ার। এর পরে তিন বছরের গবেষণা,

কিছু অতিরিক্ত গুণাগুণের প্রয়োজন হয় এখানে। অনেকেই সেই গুণকে বলেন রিসার্চ অ্যাপটিটিউড।

তিনটি প্রাথমিক এবং পাঁচটি কোলাবোরেটিভ রিসার্চ পত্র সহকারে শেষ হয় পিএইচডি। উল্লেখ্য, পিএইচডির মধ্যেও আরও নতুন বিষয়ের শিক্ষা চলতে থাকে। সেরকমই একটি সুযোগ ছিল University of Washington–এর সামার ইন্টার্নশিপে এসে। পরবর্তিতে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এই Post–Doctoral গবেষণার সুযোগ পাই। পিএইচডির শুরুর দিকের ট্রেনিং আমাকে এখনও সাহায্য করেছে এখানকার কাটিং এজ রিসার্চের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। ক্যানসার বায়োলজির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ Journal Cell, Nature Medicine, New England Journal of Medicine প্রভৃতিতে আমাদের কাজ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 2016 সালে আমাদের কাজ 'Breakthrough' খ্যাতি পায়, যেটি পরবর্তীতে প্রস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসার প্রচলিত ধারাতে পরিবর্তন আনে।

● শেষে বলব, গবেষণায় সবাই সারাজীবন ছাত্রই থেকে যায়। পিএইচডি যখন শুরু করেছিলাম তখনকার সঙ্গে আমার আজকের তফাত শুধু বয়স আর অভিজ্ঞতার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি অনুভূতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে Share করতে চাই।

a) বৈজ্ঞানিকদের সমাজ খুব ছোটো। বৈজ্ঞানিক হতে চাইলে সব বিষয়ে তোমার ধারণা থাকলেও জরুরি কোনো বিষয়ে সেরার পর্যায়ে পারদর্শিতা থাকতে হবে। তা না হলে সেরাদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

b) সময়ানুবর্তিতা এবং সর্বদা শেখার মানসিকতা একজন গবেষকের অবিচ্ছেদ্য গুণ।

c) গবেষণায় সাফল্য অনেক অসফল চেষ্টার পরে তবেই আসে। ভেঙে না পরে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা থাকতে হবে। খানিকটা Perfectionist হওয়া ও তার সঙ্গে উপযোগী প্রশ্ন করা একজন বৈজ্ঞানিকের উপযোগী একটি গুণ।

d) সবশেষে বলব, বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্রের রিসার্চ মাল্টি–ডিসিপ্লিনারি লেভেলে হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রধান বিষয় বায়োলজি হলেও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা কম্পিউটার সায়েন্সের মতো বিষয়গুলিরও প্রয়োজন হয়। বলতে গেলে, বিষয়ের গণ্ডিগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তাই ছোটোবেলা থেকেই কোনো একটি বিষয় ভালো না লাগলেও তাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু যথেষ্ট। শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেব, সব বিষয়েই কমবেশি জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করলে সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করা অনেকটাই সহজ।

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়ে অসুবিধা বা প্রস্তুতিজনিত যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে জানাতে পারো। সঙ্গে তোমাদের নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলার নাম লিখবে। E-mail : porasona123ubs@gmail.com